সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৬ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২৬ ॥ অক্টোবর ২০১৮

https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.5

প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর কালে বাংলার নারী

ময়না তালুকদার*

সারসংক্ষেপ :

নারী ও পুরুষ–মানব সংসারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং একে অপরের পরিপূরক। নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও প্রচেষ্টা জাতীয় উন্নয়ন এবং প্রগতির পূর্বশর্ত। কিন্তু কালক্রমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পুরুষ নারীর উপর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। সমাজপতিদের সৃষ্ট আইন-কানুন, বিধিব্যবস্থা পুরুষকে ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী করে তোলে, অন্যদিকে নারীর সার্বিক অধিকার খর্ব করে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ও প্রগতির ধারা থেকে নারী ক্রমশ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। নারীর এ বিচ্যুতি জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে যে ব্যাহত করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, যে-সমাজে নারী যত অবহেলিত সে-সমাজ তত অনুন্নত। নারীদের এই অধস্তন অবস্থা অন্বেষণের লক্ষ্যে প্রাক্-চৈতন্য অর্থাৎ *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত* ও *মনুসংহিতা*-র যুগে এবং চৈতন্যোত্তরকালে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের সর্বোত্তম তথা সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণপত্র বৈদিকসাহিত্য এবং মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারত*। এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহে নারীজীবনের বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে। নারী শুধু একজন নারীই নন– তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে অর্থাৎ সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন। এই বিশাল সাহিত্যে দেব-দেবতা, যাগযজ্ঞ, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদির বর্ণনা ছাড়াও তৎকালীন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণের চিত্রও ফুটে উঠেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা প্রাক্-চৈতন্যযুগের ধর্মীয় জীবন, শিক্ষাগত জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে চৈতন্যোত্তরকালের সমাজ-কাঠামো, কৃষ্টি ও সভ্যতা, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে প্রয়াসী হব।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ধর্মীয় জীবন

ধর্ম সমাজকে পরোক্ষভাবে শাসন করে। ফলে ধর্মীয় অনুশাসন সমাজজীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈদিক এবং তৎপরবর্তী *রামায়ণ*-মহাভারত-এর যুগে ধর্মচর্চায় নারীর অবস্থান কেমন ছিল, তা আমাদের জানা দরকার।

বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ ও *মহাভারত*-এ পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মচর্যপালনরতা বহু ব্রহ্মচারিণীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। *অর্থববেদে* দেখা যায়, "ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্ অর্থাৎ, কন্যারাও ব্রহ্মচর্য পালন করে পতিলাভ করতেন" (বিজনবিহারী গোস্বামী,১৯৭৮: ১১/৭/১৮)। যজ্ঞক্ষেত্রে যজমানের পত্নীকে পাশে থাকতে হতো। সেই সময়ে নারীরা পুরুষের মতো ধর্মচর্চায় সমান স্বাধীনতা ভোগ করে তাদেরই পাশে বসে একের পর এক মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। তাই আমরা লক্ষ করি বৈদিকযুগে নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি অপার্থিব বিষয় তথা ধর্মীয় কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। *ঋগ্বেদ*-এর বহু মন্ত্রেও স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ *ঋগ্বেদ-সংহিতা*-র প্রথম ম-লের ১৭৩তম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হলো :

> অর্চদ্বৃষা বৃষভিঃ স্বেদুহব্যৈর্মৃগো নাগ্নো অতি যজ্ঞ গুর্যাৎ।
> প্র মন্দযুর্মনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্ষো মিথুনা যজত্রঃ॥ (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৮৭:৩১৪)

অর্থাৎ, হব্যপ্রদায়ী যজমান অধ্বর্যু প্রভৃতির সাথে ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্য দ্বারা স্তুতি করলে তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুত ইন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবেন। হে ইন্দ্র ! মর্ত্যবাসী স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলে স্তোত্র অভিলাষী দেবতাগণকে স্তব করে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করছেন।

প্রত্যেক প্রধান যজ্ঞে 'পত্নীসংবাদ'-নামক একটি যাগ অনুষ্ঠিত হতো, যজমানপত্নীকে অংশগ্রহণ করতে হতো এবং বেদের কিছু মন্ত্র তাকে পাঠ করতে হতো। তাকে যজ্ঞবেদীর মধ্যে পুরোহিতদের সঙ্গে আসনও গ্রহণ করতে হতো। *ঋগ্বেদ*-এর অন্তর্গত কতকগুলি মন্ত্রেও সপত্নীক যজ্ঞ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, "হে ইন্দ্র ! তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতিই তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণ হব্যদানপূর্বক তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করছে। তারা গোধন ইচ্ছা করে এবং স্বর্গগমনে উৎসুক, তুমি তাদের অভীষ্ট প্রদান কর" (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৮৭:২৬১)। আবার "হে অগ্নি! তুমি বলশালী পরিণীত দম্পতি ধর্ম-কর্ম দ্বারা জীর্ণ হয়ে একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্যপ্রদান করছে" (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৮৭:৫৭৭)। উপর্যুক্ত বৈদিক মন্ত্রে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে যজ্ঞসম্পাদনের চিত্র ধর্মচর্চায় নারীর স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করে। এছাড়াও বৈদিক যুগে এককভাবে নারীর যজ্ঞসম্পাদন করার উল্লেখ পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* সাক্ষ্য দেয় যে, দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎসু

বন্দী হওয়ার পরে তাঁর স্ত্রী পুত্র লাভের আশায় ইন্দ্র ও বরুণকে হব্য ও স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করে (অর্থাৎ, বিশেষরূপে যজ্ঞ করে) ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক ত্রসদস্যু-নামক পুত্র লাভ করেছিলেন (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৮৭:৫১৯)। এছাড়া *ঋগ্বেদের* আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, "ন বৈ অপত্নীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহ্ণন্তি অর্থাৎ, দেবতারা অবিবাহিতের হাত থেকে আহুতি গ্রহণ করেন না।" *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ আরো উক্ত আছে, "অযজ্ঞিয়ো বা এষ যোৎপত্নীকঃ অর্থাৎ, অপত্নীক ব্যক্তির যজ্ঞে কোনো অধিকার নেই" (রামনাথ দীক্ষিত [সম্পা.], ১৯৭৮: ৫/১/৬/১০, ৫/১/৮/১১)। সুতরাং বৈদিক যুগের নারীরা পুরুষের মতোই মন্ত্রপাঠ, মন্ত্ররচনা, যাগযজ্ঞ, ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

বৈদিক পরবর্তী *রামায়ণ*-এর সুন্দরকাণ্ডে দেখা যায়, হনুমান অশোকবনে অবস্থিতা সীতাকে দেখে রামচন্দ্রকে বলছেন :

> এবং ময়া মহাভাগা দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
> উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্তা পুরুষর্ষভ ॥ (অমরেশ্বর ঠাকুর [সম্পা.], ২০১৫ : ৪০৩৭)

অর্থাৎ, হে পুরুষসিংহ, আমি মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতাকে কঠোর তপস্যায় রতা এবং আপনার প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী দেখেছি।

রামায়ণ-এ আরো দেখা যায়, রামের মা কৌশল্যা ছিলেন পিতা দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী। পত্নীকে ছাড়া যজ্ঞসম্পাদন সম্ভব নয় বিধায় রামচন্দ্রও অশ্বমেধযজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হয়ে যজমানের অধিকার লাভার্থে সীতার এক স্বর্ণময়ী মূর্তি গড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেছিলেন, কেননা ওই সময়ে সীতা নির্বাসনে ছিলেন।

মহাভারত-এর কোনো কোনো স্থানে 'স্বামীর সেবাই নারীর আরাধনা' এরূপ বাক্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, উপবাস প্রভৃতি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নারী-অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। *মহাভারত*-এর বনপর্বে উল্লেখ আছে, একজন ব্রাহ্মণ পা-বমাতা কুন্তীদেবীকে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ভূষিত করে অথর্ব বেদোক্ত গায়ত্রীশিরসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫:৭১১)। এ প্রসঙ্গে কুন্তীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি" (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫: ১৩৮৮)। উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনায় বলা যায় যজ্ঞে সোমের অধিকার তখনও নারীদের ছিল। *মহাভারতের* অশ্বমেধপর্বে দেখা যায়,"পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্য সমুদায়ই ভার্য্যার অধীন" (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫:১৩৬৫)। তাই ব্রাহ্মণেরা বিধিবৎ রাজসূয়যজ্ঞে অশ্ব সমানয়ন করে দ্রুপদ

আত্মজাকে অর্থাৎ, দ্রৌপদীকে সেখানে যজ্ঞকর্মের জন্য বসালেন। *মহাভারতের* এ উক্তি ধর্মচর্চায় নারীর অধিকার ঘোষণা করে। *মহাভারতের* অনুশাসনপর্বেও দেখা যায়, তপোবৃদ্ধা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সমানশীলা ও সমানব্রতচারিণী ছিলেন। তাঁর কাছে পিতৃগণ ও ঋষিগণ ধর্মের গুহ্যতম তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হতেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫:১২২৮)। এছাড়াও *মহাভারতের* উদ্যোগপর্বে আরো অনেক ধর্মপরায়ণা নারীর কথা জানা যায়। যেমন, কাশীরাজকন্যা অম্বা বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরুষদের মতো নারীরাও তখন সংসারধর্ম পালন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারতেন। *মহাভারতের* আদিপর্বে আছে : পাণ্ডুর শ্রাদ্ধকার্য সমাপ্ত হলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জননী সত্যবতীকে শোকাতুর দেখে বললেন, "...মাতঃ বনে গমনপূর্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন" (কালীপ্রসন্ন সিংহ [সম্পা.], ১৯৯০:১৮৯)। তখন পুত্রবধূদের সঙ্গে নিয়ে সত্যবতী বনে গমন করে যোগানুষ্ঠান করেন। আশ্রমবাসিকপর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখা যায় : ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীও বনে গিয়ে শেষ জীবনের তপস্যা পূর্ণ করেন। সুতরাং এই তপস্যার অধিকার জৈন ও বৌদ্ধগণের নারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, তিস্‌সা, ধীরা, উপশমা প্রমুখ বহু শাক্যনারীর গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করার কথা জানা যায়।

অতএব দেখা যায়, বৈদিক এবং তৎপরবর্তী *রামায়ণ-মহাভারত*-এর যুগে ধর্মচর্চায় নারীর অধিকার ছিল প্রায়ই পুরুষের সমতুল।

বৈদিক, রামায়ণ ও মহাভারত-পরবর্তী যুগে নারীদের ধর্মানুশীলনে বিপুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ধর্মশাস্ত্রকার মনু রচিত *মনুসংহিতা* এই বিষয়ের সবচেয়ে অধিক প্রামাণিক। *মনুসংহিতা*-য় সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে মানবজীবনের সর্ববিধ দিকের একটি ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক, নৈতিক এবং সর্বোপরি শাস্ত্রানুগ ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর ধর্মব্যবস্থায় মোক্ষলাভের কথা উল্লেখ করলেও সাংসারিক বিধি-বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বেদঅধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি সর্বপ্রকার বিধি-বিধানের কথা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছেন। নারীজাতির ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট বিধানের কথা বিবৃত করেননি। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচার-ধর্মানুষ্ঠান থেকে ক্রমান্বয়ে নারী বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আর তখন হতেই নারীর মর্যাদা ও অধিকার বিপন্ন হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে Subhra Barua-র উক্তিটি স্মরণযোগ্য :

From the time of Brahmanas distinct traces of lowering of the position of women is noticed and liberty given to women because gradually restricted. (Subhra Barua, 1997: 3)

মনু নারীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে যতখানি সোচ্চার ছিলেন ধর্মবিষয়ে নারীর অবস্থান কেমন হবে তা নিয়ে তেমন উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি বলেন :

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.], ১৯৯৩ : ২/৬৬)

অর্থাৎ, দেহশুদ্ধির জন্য পুরুষের মতো স্ত্রীজাতিরও জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে সংস্কারসমূহের আনুষ্ঠানিক কর্মসমূহ যথাসময়ে নিয়মানুসারে সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে ওই সকল অনুষ্ঠানে কোনো মন্ত্রের প্রয়োগ থাকবে না।

ঠিক এর পরের শ্লোকে মনু বলেন,

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.], ১৯৯৩ : ২/৬৭)

অর্থাৎ, বিবাহই নারীর প্রধান সংস্কার এবং বিবাহই তাদের উপনয়ন স্বরূপ; বিবাহের পর স্বামী সেবাই তাদের গুরুগৃহ বাস এবং স্বামীর গৃহকর্মই তাদের হোমরূপ অগ্নিক্রিয়া।

অতএব নারীর পক্ষে বিবাহ একান্তই কর্তব্য, বিবাহেই নারীর প্রকৃত সার্থকতা এবং মাতৃত্বেই তার চরিতার্থতা—একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়ে তিনি নারীকে ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। শুধু তাই নয়, বৈদিকযুগে যে নারী ঋষিরা ছিলেন, সেই নারীদের উত্তরসূরিদের মনু বেদমন্ত্রসহ অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠের অধিকার থেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। কারণ তাঁর মতে, নারীরা ধর্মজ্ঞ নয়, মন্ত্রহীন এবং এরা মিথ্যা অর্থাৎ, অপদার্থ।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিত।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ ॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.], ১৯৯৩ : ৯/১৮)

শিক্ষাজীবন

বৈদিক সাহিত্য, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এ উল্লিখিত তথ্যের আলোকে ওই সময়ে শিক্ষা-দীক্ষায় নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা উপস্থাপন করা হবে। বৈদিকযুগের প্রাথমিক পর্বে নারীরা শিক্ষালাভ করতে পারবে না এ রকম কোনো বিধি-নিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় সে সময়ে উচ্চশ্রেণির আর্যগণ নারীর শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতী ও উৎসাহী ছিলেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে উপনয়নবিধি[১] পুরুষের মতো নারীর ক্ষেত্রেও অবশ্যকর্তব্য ছিল। উপনয়নের পর 'দ্বিজ' হয়ে নারীরা ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, পবিত্র অগ্নি আধান করে হোম করতেন এবং বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পাঠ করতেন। এ সম্পর্কে স্মৃতিকার যম বলেছেন :

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে ।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥ (যোগীরাজ বসু, ১৯৭৫ : ১৯৭)

অর্থাৎ, প্রাচীনকালে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা নারীদের অভিষিক্ত করা হতো (উপনয়ন সংস্কার); তাঁরা বেদ পাঠ ও অধ্যাপনা করতেন এবং সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতেন ।

উপর্যুক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, বৈদিকযুগে দ্বিজ পুরুষদের ন্যায় নারীরাও বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে উপনয়নে দীক্ষিত হতেন । বৈদিকযুগে অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা নারীঋষি, শিষ্যা ও ব্রহ্মবাদিনীর[২] নাম পাওয়া যায় । ঋষি রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা ও অপালা, ঘোষা, সাবিত্রী, সূর্যা, বাক্, ইন্দ্রাণী, শ্রদ্ধা, উর্বশী, সরমা প্রমুখ এঁরা সকলেই ঋগ্বেদের কোনো না কোনো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ।[৩] এছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক নারী ঋষির নাম জানা যায়, যাঁরা *ঋগ্বেদের* সাথে জড়িত । *ঋগ্বেদে* উল্লেখ আছে যে, জুহু, শাশ্বতী, গোধা, শ্রী, মেধা, দক্ষিণা, পৌলোমী, কাক্ষীবতী, কাময়নী, গোপায়না প্রভৃতি নারী ঋষিরা প্রভূত যশ-খ্যাতির অধিকারী ছিলেন । এই তথ্য অনুসারে তৎকালীন বৈদিক সমাজে নারীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে প্রতীতি জন্মে ।

উপনিষদ্-এর যুগেও এমন অনেক বিদুষী নারীর কথা জানা যায়, যাঁরা প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন । *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এর তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও অষ্টম ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী একজন প্রথিতযশা জ্ঞানী ও বিদুষী নারী ছিলেন । তিনি বাচক্নবীর অবিবাহিতা কন্যা । মিথিলারাজ জনক কর্তৃক আহুত বিশ্বের প্রথম দার্শনিক সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং রাজসভায়, বহু জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশে, ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বিতর্কে ব্যাপৃত হন । এ বিতর্কে কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারেননি বিধায় দুজনেই বিদ্যায় ও জ্ঞানে সমান পারদর্শী বলে পন্ডিত মহলে প্রশংসিত হয়েছিলেন । আবার ওই একই গ্রন্থে মৈত্রেয়ী নামে আরেকজন ঋষি, দার্শনিক, ও অধ্যাপিকার নাম জানা যায় । ইনি তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে আধ্যাত্মিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন । সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ অভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে পার্থিব সম্পদ বণ্টন করার ইচ্ছা পোষণ করেন । তখন মৈত্রেয়ী তাঁকে 'অমরত্বের সম্পদ্' প্রদান করতে অনুরোধ করেন । তিনি পার্থিব সম্পদ উপেক্ষা করে বলেছিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ । অর্থাৎ, যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব পাব না, তা দিয়ে আমি কি করব"(অতুলচন্দ্র সেন ও প্রমুখ [অনূদিত ও সম্পা.], ১৯৮৬:৭৩০) । মৈত্রেয়ীর এই বলিষ্ঠ জিজ্ঞাসা তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ । এই দু'জন ছাড়াও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে যে, সুলভা, বড়বা, প্রাথিতেয়ী প্রমুখ বিদুষী নারীরাও অসাধারণ প্রজ্ঞার জন্য জ্ঞানী সমাজে শ্রদ্ধা লাভ করতেন (শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৩:১৬২) ।

বৈদিক যুগে পিতামাতা যে কেবল বিদ্বান্ পুত্রের কামনা করতেন, তা নয়। বিদুষী কন্যার জন্মের জন্যও তাঁদের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এ বিদুষী কন্যাপ্রাপ্তির জন্য পিতামাতার দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথার উল্লেখ আছে। সেখানে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে : কেউ যদি দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদুষী কন্যা লাভ করতে ইচ্ছুক হন; তাহলে তারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করে তাতে ঘি মিশিয়ে খাবেন।

> অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়তে সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং।
> পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ॥ (অতুলচন্দ্র সেন ও প্রমুখ [অনূদিত ও সম্পা.], ১৯৮৬ : ৮৭৫)

সুতরাং, বৈদিকযুগে নারী ঋষিরা যে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে নারীদের জ্ঞানার্জন, নৈতিকাদর্শ, এবং ব্রহ্মবাদিনীদের শিষ্য-পরম্পরাগত ঐতিহ্য বৈদিকপরবর্তী কালেও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বিভিন্ন মহাকাব্যে বিদুষী নারী ও তপস্বিনীদের কথা উল্লিখিত হওয়ায়, তা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। ঋষি ও সুপণ্ডিত রাজা জনকের রাজসভায় ভিক্ষুণী 'সুলভার' আধ্যাত্মিক আলোচনাটি *রামায়ণ*-এর একটি অত্যুজ্জ্বল অংশ। *রামায়ণ*-এর অরণ্যকাণ্ডে সিদ্ধা ধর্মসংস্থিতা সুপণ্ডিত 'শবরীর' কথা জানা যায়, যাঁর রম্য আশ্রমে রাম গিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধা তাপসী শবরী রামকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

রামায়ণে আরো দেখা যায় : "ভগবান্ বাল্মীকি যখন লবকুশকে 'ত্রয়ীবিদ্যা' শিক্ষা দিতেন, তখন আত্রেয়ী তাঁদের সঙ্গে সেই বিদ্যা শিক্ষা করতেন" (ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৫৭:৯)। এ ঘটনাটি শিক্ষাগুরুর নিকট নারী-পুরুষ একসঙ্গে অধ্যয়ন করার প্রমাণ প্রতিপন্ন করে। *মহাভারত*-এর বহু জায়গায় নারীদের শিক্ষাদীক্ষার কথা জানা যায়। *মহাভারত*-অনুসারে দ্রৌপদীর ধর্মদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল সর্বজনবিদিত। নীতিশাস্ত্র-বিষয়েও দ্রৌপদীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলে জানা যায়। *মহাভারত*-এ দ্রৌপদী ছাড়াও অনুরূপ অনেক বিদুষী নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা জ্ঞান-গরিমায় শিক্ষিত সমাজে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। ক্ষত্রিয় কন্যা বিদুলা বহু বেদ অধ্যয়ন করে বিশ্রুতা ও বহুশ্রুতা তপস্বিনী হয়েছিলেন :

> ক্ষত্রধর্মরতা দান্তা বিদুলা দীর্ঘদর্শিনী।
> বিশ্রুতা রাজসংসৎসু শ্রুতবাক্যা বহুশ্রুতা॥ (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫ : ৮১১)

এছাড়া শিবা নাম্নী বেদপারঙ্গম ও সিদ্ধা ব্রাহ্মণী সর্ববেদ অধ্যয়ন করে অক্ষয়দেহ লাভ করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে *মহাভারতের* উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

অত্র সিদ্ধা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা।
অধীত্য সাখিলান্ বেদান্ লেভে স্বং দেহমক্ষয়ম্॥ (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫ : ৭৯৪)

৪০০ খ্রিষ্টপূর্বে তাঁর ভারত ভ্রমণকালে মেগাস্থিনিস চিরকৌমার্য পালনরতা বহু সুপণ্ডিত তপস্বিনীকে দেখেছিলেন, যাঁরা সুগভীর তত্ত্বমূলক বিতর্কে ও আলোচনায় যোগদান করতেন। তিনি লিখেছেন, "বহু নারী, বিদ্বান্ চিরকুমার পুরুষ, ঋষিদের মত চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতেন এবং ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন" (যোগীরাজ বসু, ১৯৭৫:২০২)।

সুতরাং বৈদিকযুগে এবং পরবর্তী কালে নারীরা বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিলেন এবং শিক্ষাদীক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মনুর সময়ে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মনু তার *মনুসংহিতা*-য় নারীজাতির শিক্ষার বিষয়ে নীরব থেকেছেন। মনু বলেন, নারীজাতি যেহেতু গুরুগৃহে বাস না করে স্বামীগৃহে বাস করেন, সেহেতু তাদের *বেদ-উপনিষদ* গ্রন্থাদি অধ্যয়নের প্রশ্নই আসে না। শুধু নারীজাতির কাজ হচ্ছে স্বামীর গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ আর সন্তান উৎপাদন করা। এ থেকে স্পষ্টই বলা যায় : নারীজাতির উপনয়ন-এর অধিকার হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অর্থাৎ, শিক্ষার অধিকার থেকে নারীদের প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তবে *মনুসংহিতা*-য় কণ্ঠসংগীত, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, অভিনয় এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবে মনু এসব আমোদ-প্রমোদে নারীজাতির অংশগ্রহণের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেননি। হয়তো নারী-পুরুষ সকলেই এসকল প্রমোদানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তবে উল্লেখ্য যে, মনু নৃত্যোপজীবী নারীর সঙ্গে আলাপরত ও গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, নৃত্য-গীতে পারদর্শী নারীকে মনু সুনজরে দেখেননি।

রাজনৈতিক জীবন

বৈদিকসাহিত্য, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এ নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও নানা তথ্য পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ কিছু কিছু মন্ত্রে নারীর অপূর্ব বীরত্ব এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম দক্ষতার বর্ণনা পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ উল্লেখ আছে যে, নারীদেরও সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। এমন কি খ্যাতনামা রাজাদের মহিষীগণও রণাঙ্গনের পুরোভাগে নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করতেন। ঋগ্বেদের অশ্বিনীসূক্তে রাজা খেলের রানী বিশ্পলার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি নারীসমাজের এক অত্যুজ্জ্বল স্মরণীয় ঘটনা। এতে উল্লেখ আছে : "একদা বিশ্পলা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার সাথে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন

তাঁর একটি পা পাখির একটি পাখার মতো ছিন্ন হয়েছিল। ফলে তাঁর একটি উরু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শরীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে হয় এবং শল্য চিকিৎসকগণ লৌহনির্মিত একটি কৃত্রিম উরু তাঁর দেহে সংযোজন করেন—যাতে তিনি শত্রুর ধন লাভ করতে সমর্থ হন" (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত],১৯৮৭:২৩১)। এই ঘটনা প্রমাণ করে বৈদিক যুগের নারীরা সামরিক বাহিনীতেও বীরত্বের সাথে যুদ্ধকার্য পরিচালনা করতেন।

বৈদিকযুগে যুদ্ধক্ষেত্রে আরেক পটীয়সী নারী হলেন মুদ্গলানী। সেই যুগে বীরাঙ্গনাদের মধ্যে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। তিনি ছিলেন রাজা মুদ্গলের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্বামী রাজা মুদ্গলের রথ পরিচালনা ও যুদ্ধ করে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও তিনি রথ চালিয়ে স্বামীর শত্রু নিপাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন; অনুসরণকারী শত্রুসেনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিলেন। নির্ভীক, দুর্জয়সাহসী, দৃঢ়চেতা মুদ্গলানী দ্রুত পলায়নরত বহু শত্রুসেনাকে নির্ভীক চিত্তে একাকী বন্দী করেছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এ তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

> উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্ ।
> রথীরভূন্মুদগলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা ॥ (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬ : ৬০৮)

অর্থাৎ, রথচালনাকালে তাঁর বস্ত্র রথবেগবশে স্ফীত হয়ে বাতাসে উড়ছিল। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তিনি হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করেছিলেন। যুদ্ধে নিরতা অদমনীয়া এই বীর মহারথী হলেন মুদ্গলানী। তিনি বহু শত্রু বন্দী করে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

তবে বৈদিকোত্তর *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ নারীদের সামরিক প্রশিক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। *রামায়ণে* নারীর বীরত্বের চেয়ে সহনশীলতাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে সীতাকে পতিব্রতা, রামের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না ও দায়িত্ববতী নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে *মহাভারতে* দ্রৌপদীর যে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনাসমূহ রয়েছে, তা তাঁর রাজনীতিপ্রীতির সাক্ষ্য দেয়। দ্রৌপদী তাঁর স্বামী স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ে বিতর্ক করেছিলেন। *মহাভারতে* দেখা যায় : অসীম সাহসী বীরনারী সুভদ্রা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর রথ চালনা করেন ও যুদ্ধ করে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এছাড়া মেগাস্থিনিস গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদরক্ষী, তরবারিধারিণী ও ধনুর্বিদ্যা-সুদক্ষা বলবতী রমণীবাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁর *মহাভাষ্যম্*-গ্রন্থে 'শাক্তিকী' নাম্নী বর্শা বা বল্লম নিক্ষেপকারিণী নারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন (যোগীরাজ বসু,১৯৭৫:২০৫)।

বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া সত্যিই বিরল ঘটনা। সে যুগের

নারীরা যে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু *মনুসংহিতা*-য় মনু তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করেননি। তিনি রাজকার্যে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি একবারেই উপেক্ষা করে গেছেন। কারণ তাঁর সময়ে রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক তথা পুরুষকর্তৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা। তাই তিনি মনে করেন, স্ত্রীবুদ্ধি নিতান্তই চঞ্চল। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ গোপন রাখতে পারবেন না। অর্থাৎ, তিনি রাজকার্যপরিচালনে নারীকে একেবারে অনুপযুক্ত মনে করেছেন।

সামাজিক জীবন

বৈদিকসাহিত্য, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এ নারীর সুন্দর ও সমুন্নত সামাজিক জীবনের যে তথ্য পাওয়া যায়, তা পর্যালোচনা করে সে যুগের নারীর সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। *ঋগ্বেদ* এবং পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া, সাধারণভাবে নারীর প্রতি কোনো প্রকার অসহিষ্ণু বা অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় না। *ঋগ্বেদের* প্রার্থনাংশে সন্তানকামনার সময়ে প্রধানত পুত্র-পৌত্রের কামনাই ব্যক্ত করা হয়েছে। নারীর মর্যাদা কিছুটা ম্লান বলে মনে হলেও তখন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। *ঋগ্বেদ*-এ ব্রহ্মবিদুষী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্না বহু নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। এঁরা মাঙ্গলিক কর্মের জন্য আজও মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করছেন। কেবল অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের মতো সমান অধিকার ভোগ করতেন। প্রাচীন আর্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন সকলের মাঝে কল্যাণ বিতরণ করতে হলে নারীকে পঙ্গু করে রাখা যাবে না। তাই *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে নববধূকে আশীর্বাদ করে ঋষি বলছেন :

> সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
> ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥॥ (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬:৫৭২)

অর্থাৎ, তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব করো, শাশুড়ীকে বশ করো এবং ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর মতো হও।

বৈদিক সমাজে ব্রহ্মবাদিনীর ন্যায় সদ্যোবধূ নারীদেরকে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করা হতো। তাঁদের উৎসবের মাধ্যমে বিবাহ দেওয়ার সুব্যবস্থা ছিল। এই সদ্যোবধূগণ বিবাহের পূর্বে সাধারণত ষোল থেকে সতের বৎসর বয়স পর্যন্ত, শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন এবং শিক্ষা সম্পন্ন হবার সাথে সাথেই বিবাহকার্যে অগ্রসর হতেন। সুতরাং বৈদিকযুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না বলে ধারণা করা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক হয়েই নারীরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতেন। তবে নারীদের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

কোনো কথা উল্লিখিত হয়নি। তবে স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে নারীদের যে স্বাধীনতা ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

> কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ।
> ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ॥ (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬ : ৪৮৯)

অর্থাৎ, সমাজে কিছু কিছু স্ত্রীলোক আছে, যারা অর্থের লোভে নারী সহবাসে আকাঙ্ক্ষী মানুষদের প্রতি আসক্ত হয়। আবার যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হতে আপনার মনমতো প্রিয়পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।

পরবর্তী কালে, পৌরাণিক যুগে রাজকন্যাদের স্বয়ংবরসভায় বরনির্বাচন করতে দেখা যায়। তবে কন্যা পতি নিবার্চন করলেও, তাকে বসনে-ভূষণে সজ্জিত করে সম্প্রদান করা হতো বলে *ঋগ্বেদের* দশম মণ্ডলে উল্লেখ পাওয়া যায় :

> এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মা-তক্ষাম ভৃগবো ন রথম্ ।
> ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ॥ (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬ : ৫১০)

বৈদিক যুগে কন্যারা পৈতৃক সম্পত্তিরও যে অধিকার পেতেন তার উল্লেখ আছে, "হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সাথে অবস্থিতা দুহিতা যেমন নিজ পিতৃকুল থেকেই ভাগ প্রার্থনা করে, সেরূপ আমি তোমার ধন বাঞ্ছা করি। তুমি সকলের নিকট সেই ধন ও ধনের পরিমাণ প্রকাশ কর এবং তা সম্পাদন কর" (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৮৭:৩৫৬)। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত ছিল।

বৈদিক সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। তাই পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সে যুগে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের বহুবিবাহের কথা জানা যায়। *ঋগ্বেদে*-এর কয়েকটি মন্ত্রে নারীদের একাধিক পতি গ্রহণের কথা জানা যায়। যেমন, সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদ্বয়কে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। সূক্তের প্রারম্ভে সূর্যার বিবাহ শোভাযাত্রার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সোম সূর্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তার বরস্বরূপ গৃহীত হলেন। আরো উল্লেখ আছে, অশ্বিদ্বয় একটি স্ত্রী নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করেন (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬:৫৭১)। সমাজে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায়, সে সময়ে সপত্নীবিরোধের ভয়াবহ চিত্রও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের ১৪৫নং সূক্তটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সূক্তটির দেবতা হলেন সপত্নীবাধন অর্থাৎ, যে দেবতা সপত্নীকে বাধ্য করে বা অপসৃত করে। অর্থাৎ, বিবাহিত নারীরা সপত্নী দ্বারা পীড়িত হতেন এবং পীড়িত হয়ে দেবতার কাছে তার অপসারণ প্রার্থনা করতেন। এ প্রসঙ্গে নীচের উক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য :

হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায় স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করে দাও, যাতে আমার স্বামী আমার বশীভূত থাকেন, তুমি তা করে দাও। (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬: ৬৫৩)

সপত্নীবিনাশ, সপত্নী হতে স্বামীকে রক্ষা বা স্বামীর ঈর্ষামূলক মনোভাব হতে নির্বিঘ্ন হওয়া, স্বামীকে বশীভূত করার জন্য বশীকরণ মন্ত্রও পাওয়া যায়। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এ আমরা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী দুই পত্নীর সাক্ষাৎ পাই।

বৈদিকযুগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। *ঋগ্বেদের* ঋষিগণ বিধবা নারীর বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাতেন, যা সদ্য বিধবাকে উদ্দেশ করে ব্যক্ত এ-বাণী থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় :

> উদীষর্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমূপ শেষ এহি।
> হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥। (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬:৪৭৮)

অর্থাৎ, হে নারী, সংসারে ফিরে চল, গাত্রোত্থান করো, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ সে গতাসু অর্থাৎ, মৃত হয়েছে। মৃতের নিকট অবস্থান করা সমীচীন নয়। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা হয়েছে।

সে সময়ে বিধবা নারীরা দেবর ছাড়া অন্যকেও বিয়ে করতে পারতেন। মোটকথা, সেই সমাজ নারীর বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেয়নি, পুড়িয়ে মারাও শুরু করেনি ধর্ম বা সমাজের দোহাই দিয়ে। অবশ্য সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কালে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় *অথর্ববেদে*। সেখানে বলা হয়েছে,"দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে" (বিজনবিহারী গোস্বামী [অনূদিত ও সম্পা.], ১৯৭৮:৩৫৩)। তবে *অর্থববেদ*-এ সহমরণ প্রথাকে বাধ্যতামূলক না বলে, নানা প্রকার সামাজিক বিড়ম্বনার কারণে, একেবারে ঐচ্ছিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ঋগ্বেদের সময়ে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল না।

বৈদিকযুগের নারীদের শিক্ষা ছাড়াও ললিতকলাতে বিশেষ নৈপুণ্যের কথা জানা যায়। বিশেষ করে সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত ইত্যাদিতে তারা পারদর্শিনী ছিলেন। বৈদিকসাহিত্যের বহুস্থানে বলা হয়েছে : "নৃত্যং গীতং স্ত্রীণাং কর্ম।" অর্থাৎ, নৃত্য ও সংগীতপরিবেশনই নারীদের কাজ। *ঋগ্বেদের* দশম মণ্ডলের ৯৫তম সূক্তটিতে পুরূরবা

ও উর্বশীর যে কথোপকথন সংবলিত চিত্র দেখা যায়, তা সেকালে অভিনেয় ছিল বলেও প্রতীয়মান হয়।

বৈদিকযুগের পরবর্তী সমাজচিত্র বহন করে *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর কাহিনিগুলো। *রামায়ণ* আদিকাব্য বলে প্রথমেই *রামায়ণের* কথা ধরা যাক। *রামায়ণের* যুগে নারীর বিলক্ষণ সম্মান ছিল। এজন্য অযোধ্যাকাণ্ডে, দারাকে অর্থাৎ, নারীকে আত্মা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পত্নীকে পতি অপরজ্ঞানে হীনদৃষ্টিতে বা নীচভাবে দেখতে পারবে না। (অমরেশ্বর ঠাকুর [সম্পা.], ২০১৫:৮৩৭) *রামায়ণ*-এ স্বয়ংবর প্রথার উল্লেখ রয়েছে। রাজা জনকের রাজসভায় রাম হরধনু ভঙ্গ করলে সর্ব আভরণভূষিতা সীতাকে এনে অগ্নির সামনে রামের অভিমুখে রেখে জনক রাজা রামকে বললেন : "এই আমার কন্যা সীতা, তোমার সহধর্মচারিণী, তুমি একে নাও, তোমার পাণির দ্বারা এর পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগা পতিব্রতা সর্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হবে" (রাজশেখর বসু, ১৩৯৬ : ৫৯)। *রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় : কৌশল্যা দশরথের মৃত্যুর পরে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়ার ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন। তিনি রাজা দশরথকে নিস্প্রভ সূর্যের ন্যায় দেখে তাঁর মস্তক ক্রোড়ে নিয়ে বললেন :

> কিং ময়া ন কৃতং সাধু ভবেদদ্য জনাধিপ।
> যদি তেঽহং শরীরেণ সহ দাহমবাপ্নুয়াম্ ॥ (অমরেশ্বর ঠাকুর [সম্পা.] ২০১৫:১৪৩৪)

অর্থাৎ, হে রাজন্, আমি পতিব্রতা আজ যদি আপনার শরীর আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারতাম তাহলে আমার কি না সৎকার্য করা হতো।

সুতরাং কৌশল্যার এই উক্তিটি সেই সমাজে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার ইঙ্গিত দেয়। *রামায়ণের* যুগে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিলেন। এর ফলে সপত্নীবিরোধ মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। হিংসার বশবর্তী হয়েই কৈকেয়ী সপত্নীর পুত্র রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠিয়েছিলেন। সপত্নীপীড়নে জর্জরিত কৌশল্যা রামের বনগমনের কথা শুনে রামকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন : "আমি স্বামীর অনুরাগ এবং সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, পুত্র হলে সকল সুখ লাভ হবে এই আশায় ছিলাম। এখন কনিষ্ঠা সপত্নীদের কটুবাক্য শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে। নারীর পক্ষে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে? তুমি বনে গেলে আমার অবস্থা হবে কৈকেয়ীর দাসীর ন্যায় বা আরও হীন" (রাজশেখর বসু, ১৩৯৬ : ৮৫)।

মহাভারত-এ নারীর স্বাধীন সঞ্চরণ ও গৌরবময় বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। *মহাভারত*-এর আদিপর্বে উল্লেখ আছে, "অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে। কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি ॥ (১১৬/৪) অর্থাৎ, সকল স্ত্রীলোকই অনবরুদ্ধ ছিল এবং তারা ইচ্ছা অনুসারে বিহার করে বেড়াত এবং যথেষ্ট স্বাধীন ছিল"

(হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য [সম্পা.], ১৩৮৭:১২৮৫)। এছাড়া ভার্যারূপে নারীরা যে যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, তারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ *মহাভারত*-এর আদিপর্বে দেখা যায়:

> অর্দ্ধ ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
> ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥
> ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
> ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদবন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥ (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য [সম্পা], ১৩৮৭:১০২২)

অর্থাৎ, ভার্যা পতির অর্ধাঙ্গস্বরূপ, পরমবন্ধু এবং ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভের মূল কারণ। আবার যাদের ভার্যা আছে, তারাই শুধুমাত্র যজ্ঞাদিক্রিয়ার অধিকারী হয়, তারাই গৃহস্থ, তারাই আমোদ-প্রমোদ করতে পারে এবং তারাই সকল ক্ষেত্রে শোভা পেয়ে থাকে।

ভার্যারূপে নারীরা শুধু ঘরে বা সংসারেই রাজত্ব করেছেন তা নয়। সকলের আহারে-বিহারে নারীরাই কর্তৃত্ব করতেন। বনপর্বে দেখা যায়,পথশ্রান্ত দ্রৌপদীর পথখেদ দূর করতে নকুল ও সহদেব হাতের দ্বারা আস্তে আস্তে তাঁর চরণমর্দন করেছিলেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ [সম্পা], ১৯৯১:২০৬)। সে যুগে নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে মুখে কেউ কিছু বললেও সামাজিক জীবনে নারীর অনেক অধিকারই দেখা যায়। তখন প্রায়ই রাজকন্যাদের স্বয়ংবর প্রথায় বিয়ে হতো। সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রমুখ অনেকের বিবাহে কন্যারা নিজেরাই বর বরণ করেছেন। স্বয়ংবরপ্রথাতেই বোঝা যায়, তখন যুবতীবিবাহই সমধিক প্রচলিত ছিল। তবে বাল্যবিবাহ প্রথা যে ছিল না, তা নয়।

সেই যুগে নারী যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারতেন, তার খবরও পাওয়া যায় দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরের আয়োজনে। কেবল যে বিধবারাই দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করতে পারতেন তা নয়, পতি জীবিত থাকলেও কোনো কারণে যদি পত্নী বিধবারই সমান হয়ে পড়েন তবে পত্ন্যন্তর গ্রহণ ব্যবস্থার আয়োজন হতো। আর সেই কারণেই নল যখন দময়ন্তীকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং দীর্ঘকাল নলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। জানিয়ে দেওয়া হলো : নল রাজা জীবিত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। অতএব সূর্যোদয়ে দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বামী বরণ করবেন:

> সূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্ত্তারং বরয়িষ্যতি।
> ন হি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা ॥ (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য [সম্পা.], ১৩৮৩:৬১৬)

ভীমকন্যা দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করেছেন শুনে রাজা ও রাজপুত্রগণ সেখানে যেতে লাগলেন। কাজেই মহাভারত-এর যুগে দ্বিতীয়বার পতিবরণ বৈধ ও সর্বসম্মত ছিল। মহাভারত-এর যুগে নারীদের বহুবিবাহের কথাও জানা যায়। দ্রৌপদী

একই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পাঁচ স্বামীর সঙ্গে সংসার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বনপর্বের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করছেন : "তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে! মুখাপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্ব্বে তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীহি মে ॥ অর্থাৎ, অয়ি প্রিয়দর্শনে, পাঁচটি স্বামীকে তুমি কি উপায়ে তুষ্ট ও বশীভূত করে রেখেছো ? তাঁরা সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে তার রহস্যটি আমাকে বল" (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য [সম্পা.], ১৩৮৩: ২০০৩) সেই যুগে পারিবারিক অবকাঠামোতে নারীর সম্মান ছিল। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বলেন :

পুত্র আত্মাস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতাসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুক-ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান করতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। (কালীপ্রসন্ন সিংহ [অনূদিত], ২০০৫:১১১২)

সুতরাং সেই সময় থেকেই কন্যারা যে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ছিলেন তা স্পষ্ট। আবার ওই সময়ে পুত্রের মতো কন্যাদেরও রীতিমতো জাতকর্মাদি অনুষ্ঠিত হতো। তাইতো দেখা যায়, সাবিত্রীর জন্মের পরে রাজা অশ্বপতি প্রফুল্লচিত্তে কন্যার জাতকর্মাদি কার্য সম্পাদন করেছিলেন। (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য [সম্পা.], ১৩৮৩:২৪০৬)

মহাভারতে-ও বহু বিধবার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা সসম্মানে বেঁচে ছিলেন। সত্যবতী, কুন্তী এবং বহু মৃত বীরের ও কৃষ্ণের স্ত্রীদের উল্লেখ আছে, এঁরা কেউই সহমৃতা হননি; শুধু মাদ্রী একাই সহমৃতা হয়েছিলেন সেও সমাজের নির্দেশে নয়, ব্যক্তিগত অপরাধবোধে। এঁরা কেউই পুনর্বার বিবাহ করেননি। কিন্তু অম্বিকা, অম্বালিকা নিয়োগপ্রথার দ্বারা সন্তান ধারণ করেছিলেন।

বৈদিকযুগের যজ্ঞে দক্ষিণার তালিকায় নারী দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু *রামায়ণ-মহাভারত*-এ নারী দান করার কয়েকটি কারণ লক্ষ করা যায়। প্রথমত শ্রাদ্ধে, উৎসবে, যুদ্ধযাত্রায়, যুদ্ধজয়ে। দ্বিতীয়ত অতিথি আপ্যায়নে। এ-প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্যের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

তখনকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনেকে নারীকে দান করেই ক্ষান্ত থাকেননি, নারীর দেহকে ভোগ্যবস্তু মনে করে অনেক গৃহস্বামীই অতিথিকে আপ্যায়ন করতে আপন স্ত্রীকে পাঠাতেন তার শয়নকক্ষে। রাজঅন্তঃপুরের দাসীও রাজপরিবারের পুরুষদের

ভোগ্যবস্তু ছিল এমন কাহিনীও পাওয়া যায়, অর্থাৎ দাসীদের শ্রমের সঙ্গে দেহও দান করতে হতো। (সুকুমারী ভট্টাচার্য,১৩৯৪:১২৩)

উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায়, বৈদিক, *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর যুগে নারীরা সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, নারীর প্রতি অমর্যাদার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষত নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার রীতি নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।

নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রাণশক্তিতে ভারতবর্ষের সাধনা যখন ক্রমশ উদীয়মান হচ্ছিল, ঠিক তখনই মনুর সময়ে নারীর সামাজিক অধিকার কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। তিনি নারীর স্বাধীনতা, দায়িত্ব, কর্তব্য, শুচিতা প্রভৃতি বিষয় ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তবু আদর্শ হিসেবে নারীদের সম্পর্কে তিনি যে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তার অনেক উদাহরণ তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ *মনুসংহিতা*-য় রয়েছে। তিনি বলেছেন :

> যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
> যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.],১৯৯৩: ৩/৫৬)

অর্থাৎ, যেখানে নারীরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন; আর যে পরিবারে নারীরা অপূজিত অর্থাৎ, অসম্মানিত হন, সেখানে দেবতার উদ্দেশে অর্পিত যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কর্ম সমুদয় নিষ্ফল হয়ে যায়।

মনু নারীদের পতিনির্বাচন ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি বলেছেন, অপাত্রকে কন্যাদানের চেয়ে কুমারী কন্যাকে যাবজ্জীবন ঘরে রাখা ভালো, তথাপি নির্গুণ পাত্রে কন্যাসম্প্রদান করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেছেন, যথাকালে পিতামাতা কন্যার বিবাহ না দিলে কন্যা যদি স্বয়ং কোনো পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে নিতে চায়,তবে তাতে কোনো দোষ নেই। নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি হোক এটা তিনি চাননি বলেই বলেছেন, "যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমান অর্থাৎ, আত্মার সমান পুত্র, পুত্রের সমান কন্যা। সেই আত্মা থাকতে কেন অন্যে ধন পাবে ?" (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.], ১৯৯৩: ৯/১৩০)

মনুসংহিতা-য় বিবাহিত নারীকে সৌভাগ্যের দেবী হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী এবং স্ত্রী ব্যতীত স্বামী অপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন শাশ্বত এবং চিরন্তন। তিনি আরো বলেছেন, একটি পরিবারে ধনসম্পদকে যেমন অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং পবিত্রভাবে রক্ষা করা হয়, নারীদেরও একইভাবে সেই মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করা উচিত। *মনুসংহিতা*-র বিভিন্ন শ্লোকে বিবাহিত নারী সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি শ্লোক উল্লেখ করা হলো :

দেবদত্তাং পতিভার্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্ ॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা], ১৯৯৩:৯/৯৫)

অর্থাৎ, যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই পরিবারের নিশ্চিতভাবে কল্যাণ সাধিত হয়।

নারীজাতির প্রতি এমন সম্মানজনক মন্তব্য উপস্থাপন করে মনু আবার ওই *মনুসংহিতা*-য় নারীদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি নারীদেরকে সর্বাবস্থায় অধীন থাকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন :

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.], ১৯৯৩:৯/৩)

অর্থাৎ, স্ত্রীলাক বালিকা অবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের বশে থাকবে, কিন্তু কখনই স্বাধীনভাবে থাকবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নারী কোনো অবস্থাতেই পিতা, স্বামী বা পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবে না। মোটকথা, নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে জীবন-যাপন করার অধিকার নেই। এছাড়া তিনি আরো বলেন, কোনো স্ত্রীলোক কখনো স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারবে না,এমন কী নিজ গৃহেও নয় :

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি॥ (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.],১৯৯৩: ৫/১৪৭)

নারীজাতি সম্পর্কে তিনি আরো কঠোর নিয়মের বিধান দিয়েছেন : নিঃসন্তান স্ত্রীকে বিয়ের দশ বছর পরে ত্যাগ করা যায়। যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়, তাকে বারো বছর পরে, মৃতবৎসাকে পনের বছর পরে এবং কলহপরায়ণকে তৎক্ষণাৎ বর্জন করবে। তিনি আরো বলেছেন, স্ত্রী যদি ক্রোধবশত চলে যেতে চায়, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত (পঞ্চানন তর্করত্ন [সম্পা.], ১৯৯৩:৯/৮৩)। কাজেই মনুর হিসেবে স্ত্রীত্যাগ পতির পক্ষে খুবই একটি সহজ কাজ, আর পত্নীদের পক্ষে পতিত্যাগ প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

অতএব, মানবজীবন চিত্রণে মনু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীজাতিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন। অনেক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এরকম অনেক নেতিবাচক মন্তব্যও করেছেন।

চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নারীর অবস্থান

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী নেতা ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখ্তিয়ার খল্জি যখন হিন্দু রাজা বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে অতর্কিতে হামলা করে বাংলার

সিংহাসন দখল করেছিলেন, তখন বিশেষ করে সাধারণ নারীজাতির পরিণতি হয়েছিল খুবই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। ধর্মান্তরকরণ চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ব্যাপক হারে চলেছিল নারীধর্ষণ। কেননা ধর্ষিতা নারীর সমাজে কোনো স্থান ছিল না। তাই সেই অস্পৃশ্য নারীকে সমাজপতিরা অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দি করে রাখতেন। সমাজপতিদের এই বিধিবিধানের শৃঙ্খলার নিগড় অক্টোপাসের মতো নারীজীবনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। সমাজপতিদের দ্বারা এসব লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিতা অসহায় নারীদের ম্লানমুখে ছিল না কোনো ভাষার পরিস্ফুটন, ছিল না তাদের সামনে কোনো আশার আলো। শুধু তাদের বুকফাটা আর্তনাদে বিভীষিকাময় মধ্যযুগের মাটি সিক্ত হয়েছে।

জাতীয় জীবনের চরম অবক্ষয়ের দিনে নানা প্রকার অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে দেশের নারীসমাজ আচ্ছন্ন ছিল। নানা সামাজিক অনাচার তখন জগদ্দল পাথরের মতো, তাদের পিষে মারছিল। বস্তুত রান্নাঘর এবং আঁতুরঘরের মধ্যেই তখন তাদের জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। তখন এই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও আশাহত নারীর আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর ভক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়ে বাঙালি জাতি অখণ্ড রূপ নিল। এতে বাঙালির ঘটল নবজাগরণ। চৈতন্যদেব তাঁর বুকভরা ভালোবাসার খনি উজাড় করে দিলেন নির্যাতিত বঞ্চিত অসহায় নারীর উদ্দেশে। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন নারী হলো সমাজের অর্ধাংশ। এই অর্ধাংশকে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। তিনি আরো বুঝেছিলেন নারীকে অত্যাচার ও অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই আত্মপ্রত্যয়ী চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ-সমাজপতি ও মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিসম তেজে জ্বলে উঠলেন। মধ্যযুগের নারীসমাজ সংস্কারকদের হাতে নিষ্পেষিত হতে হতে যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সব ব্যাপারেই থেকেছেন নীরব, নিস্তব্ধ। মহাপ্রভুর কৃষ্ণমন্ত্রের পাবনী স্পর্শে তাঁরা কৃতার্থ হলেন। ফলে ধর্মক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলো। নারী আর পুরুষের অধীন রইলেন না, তাঁরা পুরুষের সমানাধিকার পেলেন। চৈতন্যদেবের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির ফলে নারীসমাজ ফিরে পেলেন স্বাতন্ত্র্য, নারীত্ব, আত্মসচেতনতা, স্বাধীনতা ও অধিকার। সেই অধিকারে ঋদ্ধ হয়ে নারী সামাজিক, মানসিক ও ধর্মীয় জীবনের উন্নতির সোপানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

বৈদিক ও বৈদিকোত্তর অর্থাৎ, *রামায়ণ মহাভারত*-এ নারীর যে শক্তিময়ী মূর্তি দেখা যায়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-পূর্ববর্তী সমাজে নারী জীবনে তা অব্যাহত থাকেনি। বরং সেক্ষেত্রে ঘটেছিল চরম অবনতি। সেই সময়ে কৌলীন্যপ্রথা সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছিল। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্যান্য কুপ্রথা। এসব কুপ্রথার মধ্যে

আছে : সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, দাস-দাসী কেনাবেচার প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা, গঙ্গায় বা সাগরে সন্তানবিসর্জন, অবাঞ্ছিত বিবাহ, অশিক্ষা, বিবাহিত জীবনে অসম মর্যাদা, বৈধব্যের অনুশাসন প্রভৃতি। মোটকথা, তখন অবিচার ও পরাধীনতায় নারীজাতি শৃঙ্খলিত ছিল। মধ্যযুগের নারীসমাজের ওপর এই নারকীয় প্রথাগুলো যেন জেঁকে বসেছিল। ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন কুপ্রথা থেকে মুক্তিলাভের কোনো পথ তাঁদের জানা ছিল না। তাই তাঁরা পঙ্গু সমাজের যূপকাষ্ঠে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন ভীরু বলির পশুর মতো। কিন্তু চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবসমাজ নারীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ার ফলে, এসব অপপ্রথা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থায় অর্থাৎ, মধ্যযুগে যে-অপপ্রথাগুলো সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি করে মানুষের সুস্থ সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল, সেই অপপ্রথাগুলোর অন্যতম 'কৌলীন্যপ্রথা'[৪]। সমজাতীয় সমাজে বিভিন্ন বংশকে উঁচু ও নিচু হিসেবে চিহ্নিত করে এই প্রথা সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণসমাজে এই প্রথাটি ছিল কন্যাগত। কুলীনের ছেলে কুলীন বা অকুলীনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুলীনের মেয়ের বিয়ে কুলীনের ছেলের সঙ্গেই হতে হবে। কারণ অকুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের কৌলীন্য ভঙ্গ হতো। তাই কুলরক্ষার জন্য, কুলীন ব্রাহ্মণ-পিতাকে যেন-তেন প্রকারে কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিয়ে কুলরক্ষা করতে হতো। কারণ অনূঢ়া কন্যা ঘরে রাখা, মারাত্মক বিপদ্ ছিল। একদিকে সমাজ তাকে একঘরে করে রাখত, অপরদিকে ছিল পুরুষের নারী-লোলুপতা।

কুলীন ঘরে কন্যা সম্প্রদান করে কৌলীন্য বৃদ্ধির এরূপ উন্মাদনার ফলে কুলীন কন্যার বিয়ে এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে সেই সুযোগেই কুলীন ব্রাহ্মণরা একের পর এক বিয়ে করা শুরু করেন। কোনো কোনো কুলীনের স্ত্রী-সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে, তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের নাম-পরিচয় মনে রাখার জন্য তা খাতায় লিখে রাখতেন এবং অর্থের প্রয়োজন হলেই খাতা দেখে শ্বশুরবাড়ি যেতেন। কুলীন জামাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা উপলক্ষে শ্বশুরমহাশয় তাঁকে টাকা দিতেন। 'শয্যাগ্রহণী' ছিল এমনি একটি উপলক্ষ। অর্থাৎ, টাকা না দিলে জামাতা কন্যার শয্যাসঙ্গী হতো না (রমেশচন্দ্র মজুমদার,১৩৭৫:৭৮)। তাই ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে সে যুগের একজন কুলীনকন্যার মুখনিঃসৃত বাণীতে নারীজীবনের এই মর্মান্তিক দিকের পরিচয় তুলে ধরেছেন :

> দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
> শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
> সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
> তবে মিষ্টি মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস [সম্পা.],১৩৬৯:২৬৪)

এছাড়া, সৌভাগ্যক্রমে কুলীনকন্যার বিয়ে হলেও তাদের স্বামী হতো অসম বয়সের; কেউ হতো পিতাসম, কেউ হতো কনিষ্ঠ ভ্রাতাসম (মুহম্মদ আবদুল জলিল, ১৯৮৬ : ১৫৯)। ভারতচন্দ্র আরেকজন কুলীনকন্যার মুখনিঃসৃত বাণীতে কুলীনকন্যার দুর্ভাগ্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে :

> আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
> যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
> যদি বা হৈল বিয়া কত দিনে বই।
> বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস [সম্পা.], ১৩৬৯:২৬৪)

চাহিদার তুলনায় কুলীনপাত্রের সংখ্যা ছিল কম। সে কারণে কন্যার পিতাকে তাঁর কন্যার জন্য, অধিক মাত্রায় পণের যোগান দিয়ে, পাত্রসংগ্রহ করতে হতো। সেই সুযোগ বুঝে তাঁরাও বিয়ের পরে স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে ফেলে রেখে দিতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

তাঁরা (কুলীন পতিরা) বছরে একবার করে বিভিন্ন শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করে যথাসম্ভব অর্থ আদায় করতেন এবং এই অর্থেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসব নারীরা বাপের বাড়িতে দাসীর মতো মুখ বুজে পিতার সংসারের দায় বহন করতেন। (সুতপা মুখোপাধ্যায়, ১৪০৩:১৪৭)

মোটকথা, তাঁরা প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলে চোখের জলে স্নাত করেছিলেন সমস্ত মধ্যযুগের ইতিহাস।

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত উদার বৈষ্ণবধর্মে ও সমাজে কৌলীন্যপ্রথা কিছুটা লাঘব হয়েছিল। পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা সংকুচিত হয়ে দুই বিবাহ প্রথায় রূপ নিয়েছিল। চৈতন্যমহাপ্রভু, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ—এঁদের প্রত্যেকেই দুই বিবাহ করেছিলেন। পুরুষরা দুই বিবাহ করতেন ঠিকই, কিন্তু দুই স্ত্রীকেই সমান মর্যাদা দিতেন; কাউকেই বাপের বাড়িতে দাসীর মতন ফেলে রেখে দিতেন না। তাই তাঁদের স্ত্রীরা সৌভাগ্যবতী হয়ে স্বামীর সংসার আলোকিত করতেন। কৌলীন্যপ্রথাকবলিত যুগে পণপ্রথার প্রচলন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। বৈষ্ণবসমাজ পণপ্রথা সমূলে উৎপাটন করে বিনা পণে বা পাঁচটি হরিতকী দান গ্রহণ করে পাত্রী গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সাহজিক প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না। বরং এজন্য শাস্তি দেওয়া হতো। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে নারী নিজস্ব রুচি ও ভালোলাগা অনুযায়ী পাত্রনির্বাচন করার অনুমতি পেয়েছিল। কৌলীন্যপ্রথার বেড়াজাল থেকে নারীর এই আত্মিক মুক্তি একমাত্র বৈষ্ণবসমাজই দিতে সক্ষম হয়েছিল।

মধ্যযুগের কৌলীন্যপ্রথার সুবাদে আর একটি মর্মঘাতী প্রথা সে যুগের সমাজজীবনকে কলুষিত করে তুলেছিল। আর তা হলো সতীদাহপ্রথা। সেই প্রাচীনকাল থেকে এই রাক্ষসী প্রথার কারণে কতো বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা যে প্রাণ দিয়েছে, তার কোনো হিসাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সর্বগ্রাসী কুপ্রথা সম্পর্কে তখনকার সমাজ-সংস্কারকদের বক্তব্য ছিল এই :

যজ্ঞ, ব্রত, উপবাসাদিতে নারীর কোন পৃথক্ অধিকার নেই, পতিসেবাই তার একমাত্র কাম্য ও ধর্ম। তাই পতির মৃত্যুর পরে তার জীবন ধারণ অসার্থক ব্যাপার। পতির মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীকে পুড়িয়ে ফেলাই ন্যায়সঙ্গত। তবে কোন কোন স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সতী হতেন, কোন বাধা মানতেন না এবং জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়েও কোন কাতরতা প্রকাশ করতেন না। আবার কোন কোন অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে রাজি করিয়ে, তারপর সে মরতে না চাইলেও, তাকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হত। (অতুল সুর, ১৯৭৬:৯২)

নারী নিজেকে পতির সঙ্গে দগ্ধ করতে না পারলে সমাজে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো। বিধবা হয়ে সমস্ত শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে সকলের অনাদর, অবহেলা, অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে বেঁচে থাকা কষ্টকর। সর্বোপরি তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকদের বিধি-বিধানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকার চাইতে বেশির ভাগ নারীই বৈধব্যযুক্ত নারীত্বের চাইতে সতীনারীর নারীত্ব, অর্থাৎ সহমরণ বা অনুগমনকেই বেছে নিত।

এই সামাজিক কুপ্রথার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করেছে বৈষ্ণবসমাজ। বৈষ্ণব নারীসমাজ এই পাশবিক ও নারকীয় প্রথার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু অতিক্রম করে, মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির অবসান ঘটিয়েছেন। তারা অপার্থিব জীবনের স্বর্গসুখ ইত্যাদির চেয়ে পার্থিব জীবনে স্বামী-সন্তানের মধ্যে থেকে সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও আনন্দময় জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছেন। তাই স্বামী হারানোর দুঃখ বা কষ্ট সাময়িকভাবে নারীদের বিপর্যস্ত করলেও, নারীসত্তাকে একেবারে ভেঙে দিতে পারেনি। বরং তাঁরা বৈধব্যের ক্লেশ মুছে ফেলে আবার অদম্য উদ্যমে সংসারজীবন শুরু করেছেন। তাই এসব দৃঢ়চেতা নারীকে কোনো সমাজ-সংস্কারক তাঁদের স্বামীর মৃত্যুর পরে, সহমরণের জন্য বলপ্রয়োগের স্পর্ধা দেখাতে সমর্থ হয়নি। মোটকথা, চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে নারী তার প্রকৃত ভূমার সন্ধান পেয়েছিল। শচীদেবী বিধবা হয়েছেন, কিন্তু সহমরণে যাননি। অদ্বৈতপত্নী সীতা, নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী, শ্রীনিবাসপত্নী ঈশ্বরী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া—এঁদের কেউই বিধবা হয়ে সহমরণে যাননি (বিমানবিহারী মজুমদার, ১৯৬১: ৪৫৩)।

মধ্যযুগীয় নারীসমাজের কাছে আরো একটি যন্ত্রণাদায়ক প্রথা হলো বাল্যবিবাহ। সম্ভ্রান্ত ঘরের এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ

ঘরের মেয়েদের লেখাপড়ার প্রথা এক রকম উঠে গিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হবে। দ্বিতীয়ত, বাল্যাবস্থা পার হতে না হতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। এ-প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তিটি স্মরণযোগ্য :

সপ্তম বৎসরে কন্যাদান খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বৎসরের অধিক বয়স পর্যন্ত কন্যার বিবাহ না দিলে গৃহস্থ নিন্দনীয় হতেন এবং এটা অমঙ্গলের কারণ বলে বিবেচিত হত। কন্যার বয়স দশ পেরিয়ে গেলে তার পরিজনদের একঘরে হয়ে থাকতে হত। ধোপা, নাপিত ও পুরোহিত পর্যন্ত তাদের ঘরে যাতায়াত বন্ধ করে দিতেন। তাদের সঙ্গে কেউ সামাজিক আদান-প্রদান করতেন না, এমনকি কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাদের নিমন্ত্রণ করতেন না। এসব সামাজিক শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যেন-তেন প্রকারে যে-কোন পাত্রের কাছে পিতা তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতেন। (রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৭৫: ৩০০)

এই ধরনের বাল্যবিবাহের ফলে বিধবার সংখ্যাও খুব বেশি ছিল। সমাজপতিদের বিধানঅনুযায়ী, এসব বাল্যবিধবাকে থান কাপড় পরতে হতো। যে-কোনো ধরনের অলংকার পরিহার করতে হতো। মাছ, মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বর্জন করতে হতো, একাদশীতে একেবারে উপবাসী থাকতে হতো, সচরাচর জনসমক্ষে বের না হয়ে ঠাকুরঘরের মূর্তির কাছে বসে থাকতে হতো (অতুল সুর, ১৯৭৬ :৮৮)। তারা এসব কঠোর বিধিবিধানের প্রতিবাদ করার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছিল।

বৈষ্ণবসমাজে—যদিও অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেবার রীতি ছিল—কিন্তু দশ পেরিয়ে গেলেও কন্যার পরিজনদের কোনো সামাজিক শাস্তি পেতে হতো না বা কন্যাকেও যার তার-হাতে বিয়ে দেওয়া হতো না। কন্যা যদি কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইতো, তাতেও সমাজের কেউ আপত্তি করতো না। সেই সময়ে কন্যার পিতারা কন্যার বিয়ের জন্য নানা জায়গায় খোঁজ-খবর নিয়েই তারপর কন্যাকে পাত্রের হাতে সম্প্রদান করতো। সুতরাং বৈষ্ণবসমাজে বাল্যবিবাহের কঠোরতা অনেক হ্রাস পেয়েছিল।

চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তিকালে প্রচলিত পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা সমাজব্যবস্থাকে একেবারে কলুষিত করে তুলেছিল। বহুবিবাহের ফলে বহু স্ত্রীকে নিয়ে এক পুরুষের বসবাস একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই নারীর কাছে সংসার সুখের ও শান্তির না হয়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারও ছিল নির্মম। শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া নারীর আর কোনো প্রয়োজনই যেন ছিল না। তাই সুন্দরী নবাগত, যুবতী ও সন্তান জন্মদানকারিণীর কদর স্বভাবতই স্বামীর কাছে বেশি হতো। এর ফলে পুরাতন, কুৎসিত,

বিগত যৌবনা স্ত্রীদের মাঝে জন্ম নিত নানা প্রকার ঈর্ষা, মাৎসর্যপরায়ণতা, লোভ, অভিমান, হিংসা প্রভৃতি। এঁদের মনের সুকুমার ও নান্দনিক অনুভূতিগুলোর বিনাশ ঘটত। তাই তাঁরা নিজেদের অধিকারকে সমাজ ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হিংস্র সাপিনীর মতন হয়ে উঠতেন। সপত্নীর প্রতি ভগ্নীসুলভ আচরণের পরিবর্তে তাঁরা শুরু করতেন নির্মম অত্যাচার। আবার অনেক নারীই সপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিতেন। আবার কেউ বা বশীকরণমন্ত্রের সাহায্যে স্বামীকে বশ করার নারকীয় লোভ ও আনন্দে মেতে থাকতেন।

চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবসমাজে কিন্তু অন্যরকম চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সেখানে সপত্নীযন্ত্রণার পরিবর্তে সপত্নীদের সাথে ভাল ব্যবহারের চিত্র দেখা যায়। সে যুগে পুরুষরা সকল স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করতেন বলে নারীরা অনেক বেশি উদার ও নিঃস্বার্থ ছিলেন। তাঁরা অপরের সুখে সুখী এবং অপরের দুঃখে দুঃখী ছিলেন। কারণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা বৈষ্ণবসমাজের, নরনারী-নির্বিশেষে, সকলের মধ্যে নেই বললেই চলে। তাঁরা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে মশগুল ছিলেন। তাই ঝগড়া-বিবাদে সময় নষ্ট না করে কৃষ্ণসেবায় ও ভক্তসেবায় জীবন উৎসর্গ করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

চৈতন্যপূর্ববর্তী সময়ে দাসদাসী প্রথাও একটি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। বিবাহের সময়ে নববধূর সঙ্গে অসংখ্য যুবতী দাসীকে, এমন কি বধূর ভগ্নীকেও যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হতো। এসব দাসদাসীর প্রতি গৃহপতিদেরই অধিকার বেশি থাকত। কখনো গৃহপতিরা দাসীগণকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁদের যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য দাসীদের ব্যবহার করা হতো। যদি কোনো কারণে দাসীরা এতে অসম্মতি জানাতেন তাহলে তাঁদের ওপর চলত নির্মম নির্যাতন। অথচ বৈষ্ণবসমাজ দাসদাসীর আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, ভক্তজনের মধ্যে তাঁদের স্থান দিয়েছেন এবং তাঁদের মানসিক অনুভূতিগুলোর বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাই তাঁদের ম্রিয়মাণ ও মূঢ়ম্লান মুখে ভাষা ও আবেগের সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের ক্লান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে বৈষ্ণবসমাজ আশার আলো জ্বালাতে সমর্থ হয়েছে। এতদিন যাঁরা মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করেছেন, তাঁরাই বৈষ্ণবসমাজের উদারনৈতিক পতাকার তলে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কারণ তাদের মানসিক ভয় ও ক্লীবতার অবসান হয়েছে।

কৌলীন্যকবলিত সমাজে কন্যাসন্তনের জন্ম অসহায়ত্বক্লিষ্ট। কারণ ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্যপ্রথার যুগে কুলীন কন্যার বিবাহ দেওয়া যেহেতু কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল, তাই কন্যাসন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অপসারণ করার একটা প্রবৃত্তি পিতা-মাতার মনে জাগ্রত হতো। এ-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

কন্যাসন্তানের জন্মে কেউ আনন্দ প্রকাশ করত না, শঙ্খধ্বনি করত না আর উৎসব করা তো দূরের কথা ছিল। তাই পরবর্তী সময়ে গঙ্গাসাগরের মেলায় নিয়ে কন্যাসন্তানটিকে সাগরের জলে নিক্ষেপ করে নির্বিঘ্নে চলে আসতেন। আবার অনেকে মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে না দিয়ে, মন্দিরের দেবতার নিকট দান করতেন। মন্দিরের পুরোহিতরা এই সকল মেয়েদের নৃত্যগীতে পটীয়সী করে তুলতেন। এদের দেবদাসী বলা হত। (অতুল সুর, ১৯৭৬:৯২)

সামাজিক-আর্থিক কারণে কন্যাসন্তানের প্রতি এমন অমানবিক বীভৎস কুপ্রথার কথা কী চিন্তা করা যায়?

কন্যাসন্তানের অনাদরের এমন চিত্র বৈষ্ণবসমাজে পরিলক্ষিত হয় না। পুত্র ও কন্যাকে তাঁরা সমান চোখে দেখতেন, আলাদাভাবে দেখতেন না। বরং তখনকার সমাজের পিতামাতারা কীভাবে কন্যাকে মানুষ করে উপযুক্ত পাত্রের হাতে পাত্রস্থ করা যায় সেই চিন্তাই করতেন। গঙ্গায় নিক্ষেপ করার চিন্তা বা মন্দিরে দান করার কথা তাঁদের মনের কোণেও ঠাঁই পেত না। সুতরাং কন্যাসন্তানের প্রতি এমন অবিচার, অবহেলা এবং মধ্যযুগীয় কলঙ্কময় সামাজিক মনোবৃত্তির পুরোপুরি অবসান ঘটিয়েছে এই বৈষ্ণবসমাজ।

উপর্যুক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বলা যায়, *বেদ*, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এর যুগে, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ব্যতীত, নারীর অবস্থান সম্মানজনকই ছিল। কিন্তু মনুর বিধিবিধান নারীর এ-অবস্থানকে অনেকটা অবনতির মুখে *ঠেলে* দেয়। এ-অবনতির ধারা মনু-উত্তর সময়ে প্রকট আকার ধারণ করে নারীকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ফলে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতিতে নারী হয়ে পড়ে পশ্চাৎমুখী। জাতীয় উন্নয়নের ধারা থেকে নারী বঞ্চিত হয়ে গৃহের চৌকাঠে বন্দি হয়ে পড়ে। ফলে নারীর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং জীবনযাপন পুরুষনির্ভর হয়ে ওঠে। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নারীকে পুনর্জাগরিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি নারীকে নৈতিক, মানসিক এবং আত্মিক বলপ্রদানের মাধ্যমে বলীয়ান্ করে স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ করে তোলেন। চৈতন্যদেব নারীপেষণকারী বিভিন্ন সামাজিক প্রথা (যেমন : কৌলীন্য, সহমরণ, বৈধব্যের অনুশাসন প্রভৃতি) বিলুপ্ত করে নারীকে সমাজে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগান। ফলে *বৈদিক সাহিত্য*, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এর পরবর্তী সময়ে নারীর যে বিপর্যয় ঘটে, চৈতন্যোত্তরকালে তার কিছুটা উন্নতি হয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. উপনয়ন মানে সমীপে নয়ন (আনয়ন)। যা দ্বারা বালক বা বালিকা বেদ অধ্যয়নের জন্য গুরুসমীপে নীত হয়। অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ উপনয়নের মুখ্যকাল। এই সংস্কার দ্বিতীয় জন্ম বলে ব্রাহ্মণরা 'দ্বিজ' বা 'দ্বিজাতি' -নামে পরিচিত। (যোগীরাজ বসু, ১৯৭৫ :১৯৭)

২. যাঁরা অধিক দিন অবিবাহিতা থেকে বা সারাজীবনও অবিবাহিতা থেকে বিদ্যাচর্চায় জীবন অতিবাহিত করতেন, তাঁদেরকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হয়। (যোগীরাজ বসু, ১৯৭৫ :১৯৬)

৩. দ্র. ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম মণ্ডল (১২৫ ও ১৭৯ নং সূক্ত), পঞ্চম মণ্ডল (২৮ নং সূক্ত), অষ্টম মণ্ডল (৯১ নং সূক্ত), দশম মণ্ডল (৩৯, ৪০, ৮৫, ৯৫ ও ১০৮ নং সূক্ত)। (রমেশচন্দ্র দত্ত [অনূদিত], ১৯৭৬)

৪. এই কৌলীন্য প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ বিধি নয়। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ বা তার কিছু পরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতির মধ্যকার কতিপয় কয়েকটি ব্যক্তিকে গুণানুসারে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করা হয়, এঁদের সাধারণ নাম হয় কুলীন। (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৫:৪৭)

গ্রন্থপঞ্জি

অতুল সুর (১৯৭৬)। *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ।

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ (অনূদিত ও সম্পাদিত) (১৯৮৬)। *উপনিষদ্, (বৃহদারণ্যকোপানিষদ্)*। অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা।

অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পাদিত) (২০১৫)। *রামায়ণম্* । বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত) (২০০৫)। *মহাভারত* (১ম ও ২য় খণ্ড)। বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।

কালীপ্রসন্নসিংহ (সম্পাদিত) (১৯৯০)। *মহাভারত* (১ম ও ২য় খণ্ড)। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।

ক্ষিতি মোহন সেন (১৩৫৭)। *প্রাচীন ভারতে নারী* । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত) (১৯৯৩)। *মনুসংহিতা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পরিমার্জিত সংস্করণ, কলিকাতা।

বিজনবিহারী গোস্বামী (অনূদিত ও সম্পাদিত) (১৯৭৮)। *অর্থববেদ-সংহিতা* । হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা।

বিমানবিহারী মজুমদার (১৯৬১)। *গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) (১৩৬৯)। *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী* । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ।

মুহম্মদ আবদুল জলিল (১৯৮৬)। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

যোগীরাজ বসু (১৯৭৫)। *বেদের পরিচয়*। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলিকাতা ।

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত) (১৯৮৭)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথম খণ্ড)। হরফ প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত) (১৯৭৬)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৩৭৫)। *বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী প্রগতি* । কলকাতা।

রাজশেখর বসু (১৩৯৬)। *বাল্মীকি-রামায়ণ* (সারানুবাদ)। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি. কলিকাতা।

রামনাথ দীক্ষিত (সম্পাদিত) (১৯৭৮)। *শতপথ ব্রাহ্মণম্* । চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, প্রথম সংস্করণ, বারাণসী।

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩)। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা* । সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।

সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৩৯৪)। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. কলকাতা।

সুতপা মুখোপাধ্যায় (১৪০৩) । *বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্যে নারীসমাজ* । কলিকাতা।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) (১৩৮৩)। *মহাভারতম্* (২য় খণ্ড)। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) (১৩৮৭)। *মহাভারতম্* (৩য় খণ্ড)। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

Subhra Barua, 1997. Monastic life of the Early Buddhist Nuns. Atisha Memorial publishing House, Calcutta.